১১.১ ঔপনিবেশিক কালপর্বে নারী শিক্ষা

সাধারণভাবে ভারতের ইতিহাসে স্ত্রী শিক্ষার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে এক বিপরীতধর্মী চরিত্র নজরে আসে। অতীতে স্ত্রী শিক্ষার চিত্র যতখানি উজ্জ্বল পরবর্তীকালে শিক্ষার ব্যাপ্তি ও পরিধি সংকুচিত হয়ে ঔজ্জ্বল্যকে মলিন করেছিল। ঋগ্বেদের সময়কাল থেকে নারীর সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষায় পারঙ্গমতার নানা উদাহরণ পাওয়া যায়, তেমনি নারী জীবনের অন্ধকারময় উদাহরণও পাওয়া যায় পরবর্তী বৈদিক যুগের সাহিত্যে। বিভিন্ন সাহিত্যের রচনাকার যেমন নারী ছিলেন তেমনি বিভিন্ন সাহিত্যের চরিত্রেও নারী ঠাঁই পেয়েছিল। রোমিলা থাপার অবশ্য মনে করেন, প্রাচীন ভারতে নারীর অগ্রগতি কখনোই সমান্তরাল ছিল না। কোথাও নারী পেয়েছিলেন মর্যাদা, আবার কোথাও ছিলেন তাঁরা নির্যাতিতা। বৌদ্ধ ধর্মে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীকে স্বতন্ত্র চিন্তার সুযোগ দিয়েছিল। মুঘল ভারতে নারী শিক্ষার অগ্রগতি নিয়ে যে সব উদাহরণ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত সীমিত। সে যুগে উচ্চবর্ণের নারীদের শিক্ষাগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও নিম্নবর্ণের নারীরা শিক্ষার বাইরে ছিল না। ভারতবর্ষে প্রথম নারী শিক্ষার বিস্তারের জন্য একটি পৃথক মহিলা বিদ্যালয়ের প্রস্তাবটি এসেছিল উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখার্জির কাছ থেকে। তবে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতির ভগীরথরূপে চিহ্নিত করা যায় জন ইলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনকে। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠকখানায় একুশ জন বালিকাকে নিয়ে বেথুন শুরু করেন 'Calcutta Female School'। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রথাগত শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরকে বিশেষরূপে সূচি শিল্প ও অঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শী করে গড়ে তোলার কথা ঘোষিত হয়। ভারত সরকারের পক্ষে লর্ড ডালহৌসির সহযোগিতায় বেথুন প্রতিষ্ঠিত 'Hindu Female School' লোকমুখে পরিচিতি লাভ করে 'বেথুন স্কুল' নামে।[৪] ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুল একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি কলেজিয়েট স্কুলে রূপান্তরিত হয়। নারী শিক্ষার বিষয়ে বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের

Scanned with CamScanner

আন্তরিক প্রচেষ্টা শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করলেও নারী শিক্ষার অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ। প্রাথমিক শিক্ষায় নারীদের প্রবেশাধিকার সহজ থাকলেও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে কঠিন প্রতিরোধের বেড়া ভেঙে এগোতে হয়। শিক্ষকতা সেযুগে ছিল একটি পেশা। এছাড়াও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা জনপ্রিয় হওয়ায় মহিলা ডাক্তারেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে একটি অব্যাহত গতি থাকলেও তার ফলাফল কখনোই সন্তোষজনক ছিল না। গ্রাম অপেক্ষা শহরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ততখানি কুসংস্কার কাজ করত না। এসব সত্ত্বেও বিংশ শতকের সূচনায় দেখা যায় সারাদেশে মাত্র ৪.৫ লক্ষ মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল। লর্ড কার্জন শিক্ষার সংকোচনে আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় স্কুল পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলার আনুপাতিক হার ছিল ১০ : ১। জনগণ সংস্কারপন্থী হওয়ার ফলে এবং বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় বর্ণহিন্দুদের মধ্যে যেমন শিক্ষার গতিকে হ্রাস করেছিল তেমনি সংস্কার মুসলিম মহিলাদের পর্দাসীন করে রেখেছিল। উচ্চবর্ণের মানুষজন মেয়েদের স্কুল শিক্ষাগ্রহণ থেকে সরিয়ে অন্দর মহলে রাখায় আগ্রহী ছিলেন বেশি। গৃহ শিক্ষিকার মাধ্যমে মহিলাদের পর্দার অন্তরালে রাখার প্রবণতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি পুরুষদের পরিবর্তে মহিলাদের জন্য মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আগ্রহ বাড়তে থাকে। নারী শিক্ষার অনগ্রসরতার পিছনে অন্যতম সমস্যা ছিল সামাজিক বাধা। লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সময় সরকার গুরুত্ব দিয়েছিল একটি বোর্ড গঠনের (১৯১৯)। উচ্চশিক্ষায় সংখ্যায় কম হলেও ধীরে ধীরে মেয়েদের সাফল্য বাড়তে থাকে। কলেজে প্রবেশের জন্য যোগ্যতার পরিবর্তে সাহসই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে এসে মেয়েদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল একটি ছোটো জগৎ। বেনারসের শিবপ্রসাদ গুপ্ত এবং কলকাতার বিনয় সরকারের প্রেরণায় কার্ভের নেতৃত্বে পুনাতে প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় (১৯১৬)। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দেখা যায়, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে গড়ে ওঠে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। আর. জি. ভাণ্ডারকর, আর. পি. পরাঞ্জপে ও ভিঠলদাস থ্যাকারের সহযোগিতায় পশ্চিম ভারতে নারী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে। সরকারি আইনের ফলে শহরাঞ্চলে উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহের পরিমাণ কমে আসায়, বিধবাদের পুনর্বিবাহ ক্রমশ বিস্তার লাভ করায় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণের ফলে মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা কিছুটা উন্নত হওয়ায়, উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনে তাদের প্রবেশ বাড়তে থাকে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব সরকার নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ; ঠিক একই বছর মধ্যপ্রদেশে বেসরকারি ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশকে গুরুত্ব দিয়ে সেখানকার সরকার নারীশিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সেন্ট থেরেসা কলেজ, ত্রিবান্দ্রমে মহারাজা

Scanned with CamScanner

কলেজ নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পাঞ্জাবের লাহোর কলেজ, উত্তরপ্রদেশের ইসাবেলা থোবার্ন কলেজ, বেনারস ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রমাণ করে ভারতে নারী শিক্ষার অগ্রগতিকে। কলকাতাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছেলেদের কলেজে ৭৩৮ জন মেয়ে উচ্চশিক্ষায় রত ছিলেন (১৯২৭)। সারাদেশ জুড়ে মিশ্র প্রাথমিক শিক্ষা ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে হার্টগ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর ভারতবাসীর অভিযোগগুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়। নারী শিক্ষার বিষয়ে সরকার যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি সে কথা এ রিপোর্টের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছিল। বম্বে প্রেসিডেন্সিতে অবশ্য নারী শিক্ষার হার ছিল সবচেয়ে বেশি। এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশ, শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। মানুষের মনে ধারণা জন্মে, মাতা যদি শিক্ষিত হয় তাহলে শিশুর শিক্ষায় পথ আরও সুগম হবে এবং শিক্ষার মধ্য দিয়েই ভারতীয় নারীরা দেশের কৃষ্টিতে আরও বেশি অবদান রাখতে পারবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটেছিল তার পিছনে ছিল সরকারি অফিসে মহিলাদের কাজের সুযোগ, বাণিজ্যিক সংস্থায় মহিলাদের কর্মী হিসাবে নিয়োগ এবং বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষিকার নিয়োগ। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যবিত্তদের উপর যে আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয় সেটি মোকাবিলা করার জন্যও ঘরের মেয়েরা যুক্ত হয় বাইরের কাজে। ভারতীয় সমাজও ক্রমশ বৃত্তিজীবী মেয়েদের মেনে নিতে থাকে। একই সাথে উচ্চশিক্ষা লাভ মহিলাদের মধ্যে স্বনির্ভরতার প্রবণতাকে জাগিয়ে তুলেছিল।[৫] ঔপনিবেশিক শাসনকালে আধুনিকতার সূত্রে নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিল যেমন শাসকদল তেমনি ভারতীয় সমাজ সংস্কারকরা ও শিক্ষিত ভারতীয় নারীর একাংশ। শাসক-সংস্কারক এবং শিক্ষিতা নারীর দল সকলেই সমাজের জন্য গড়তে চেয়েছিলেন এক নতুন 'নারীর দল'। ঔপনিবেশিক সরকারের গভর্নর জেনারেলের আইনসভার সদস্য বেথুনের নারী শিক্ষা নিয়ে সদর্থক পদক্ষেপ যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, প্রসঙ্গক্রমে হান্টার কমিশনের (১৮৮২) নারী শিক্ষার জন্য অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির সুপারিশও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। ঔপনিবেশিক সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের প্রবেশাধিকারের সুযোগ ঘটলেও তা ছিল খুবই সীমিত। ভারতীয় পুরুষ সংস্কারকরা নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বাংলার রাধাকান্ত দেব ও কেশবচন্দ্র সেন (ব্রাহ্ম সমাজ), পশ্চিম ভারতে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (প্রার্থনা সমাজ), উত্তর ভারতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (আর্য সমাজ) এবং মাদ্রাজে এ্যানি বেসান্ত (থিওসোফিক্যাল সোসাইটি) নারী শিক্ষা নিয়ে শুধু চিন্তাই করেননি, তাঁরা সেই ভাবনারও প্রতিফলন

Scanned with CamScanner

ঘটিয়েছিলেন নানা প্রতিষ্ঠান গড়ার মধ্য দিয়ে।[৬] নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে যেসব শিক্ষিত ভারতীয় নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পশ্চিম ভারতের পণ্ডিতা রমাবাঈ, দক্ষিণ ভারতের ভগিনী সুব্বালক্ষ্মী এবং পূর্ব ভারতের বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন।[৭] ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নারী শিক্ষা এবং নারীদের অগ্রগতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেও আলোচ্য সময়কালে জনসংখ্যার তুলনায় যেমন নারীশিক্ষার অগ্রগতি ছিল খুব কম তেমনি নারীদের সামাজিক অবস্থানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে গবেষক Geraldine Forbes[৮] ও Gail Minault[৯]-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের গবেষণার সারমর্ম হল ঃ নারী শিক্ষা আন্দোলনের উদ্দেশ্যের মধ্যে কখনোই 'নারী মুক্তি'র বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। একদিকে ঔপনিবেশিক শাসক দলের উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরা যে সন্তানের জন্ম দেবে তারা অধিকাংশই হবে রাজানুগত। শিক্ষিত ভারতীয় আমলারা শিক্ষিত নারীদের বিবাহ করলে মানবিক যন্ত্রণা ভোগ করবে না। অন্যদিকে ভারতীয় পুরুষরাও চেয়েছিল জ্ঞানালোক প্রাপ্ত নারী, তাদের আদর্শ সঙ্গিনী যেন হয়ে ওঠে। পুরুষ সমাজ চাইছিল নারী হয়ে উঠুক একদিকে আত্মত্যাগী হিন্দু স্ত্রী অন্যদিকে ভিক্টোরিয়ান যুগের সহধর্মিণী। তাই সে যুগের নারী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় সাধ্বী স্ত্রী, সুমাতা ও আদর্শ গৃহিণী তৈরি করা।[১০] অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলাদের মনেও একটি 'লক্ষণরেখা' বিরাজ করত। নারীদের এই লক্ষণরেখাটি ছিল গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে আবর্তিত। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' আমাদের পরিচয় ঘটায় সে যুগের 'নবীনার' সঙ্গে। গল্পের নায়িকা সুশীলা উচ্চ শিক্ষিতা, বাইরের পৃথিবীকে চিনেছে। এই সুশীলার বিয়ে হয় এক সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে। কর্মের সূত্রে স্বামীর ঊর্ধ্বতন অফিসারের স্ত্রীর সঙ্গে সুশীলার বন্ধুত্ব হয়। ইংরেজিতে কথা বলে স্বামীর পদন্নোতির ব্যবস্থা করে। একই সঙ্গে বাড়ির পরিচারিকার মনে উন্নত জীবনযাত্রার স্বাদ এনে দেয়। সুশীলার উপাখ্যানের মূল বক্তব্য ছিল, 'প্রতিটি মেয়ে লেখাপড়া শিখে হবে 'সুশীলা'। শিক্ষাকে পুঁজি করে তাদের যেমন সমাজ সংস্কারক হতে হবে তেমনি স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হতে হবে। সে যুগের নারীকে পুরুষরা কেমনভাবে চেয়েছিল তার সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে সুশীলার উপাখ্যানে। মারাঠি মহিলা তারাবাঈ সিন্ধে তাঁর রচনার[১১] মধ্য দিয়ে সে যুগের পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও তিনিও চেয়েছিলেন সুখী পরিবারে নারীর মর্যাদা ও সম্মান। সে যুগের পুরুষরা (তিনি জাতীয়তাবাদী হন বা সমাজ সংস্কারক হন) চেয়েছিল পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের অধিকারকে যেমন রক্ষা করতে তেমনি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রও চেয়েছিল নারীর জীবন যেন গার্হস্থ্য জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নারীর অবস্থান নিয়ে গুরুত্ব যে বৃদ্ধি পেয়েছিল সেগুলি বিশ্লেষণ

Scanned with CamScanner

করতে গিয়ে সাম্প্রতিক গবেষকরা নানা নতুন তথ্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় (১৮৩৮) প্রকাশিত একটি চিঠির অংশ তুলে ধরলে সে যুগের নারী শিক্ষা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কী ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে ঃ "দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে সান্ত্বনা ও সাহায্যের দরকার তাহা কি তিনি অজ্ঞান স্ত্রীর নিকট হইতে পাইতে পারিবেন?"[১২] স্বভাবতই এই চাহিদাটি পূরণের জন্য নারীকে বিশেষরূপে কল্পনা করাও শুরু হয়। রাসকিনের 'Sesame and Lilies' (1865) এবং টেনিসনের 'Princess' রচনা ইউরোপে নারীর যে ভাবমূর্তি তুলে ধরেছিল তার একটি বড়ো ছাপ দেখা গিয়েছিল নতুন 'ভারতীয় নারী' কল্পনায়। সমাজ সংস্কারকদের ভারতীয় নারীর ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে প্রচার, মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে অবস্থান এবং লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যে মাতৃত্বের প্রতীক রূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা থেকেই তৈরি হয়েছিল বাঙালিদের 'ভদ্রমহিলা' কল্পনার। মেয়েদের জন্য পাঠক্রম নিয়ে যে বিতর্কতার মধ্যেও ধরা পড়ে সমাজ সংস্কারকদের প্রকৃত লক্ষ্যটি। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব কেশবচন্দ্র সেন মনে করতেন, মেয়েদের বিজ্ঞান, অঙ্ক ও ভূগোল পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের সাহিত্য, ধর্ম, সেলাই, গৃহবিজ্ঞান এসব পড়াই উচিত। কারণ মেয়েদের স্থান তো মূলত ঘরের মধ্যেই।[১৩] যদিও শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো ব্রাহ্মরা চেয়েছিলেন ছেলেদের মতোই মেয়েদের পাঠক্রম এক হবে। সে যুগের মেয়েরাও ছেলেদের মতো লেখাপড়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন না। মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *বঙ্গ মহিলা* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল 'স্বেচ্ছাচারিতার রূপ স্বাধীনতায় বঙ্গ মহিলাদের কাজ নাই তাহাদের যে স্বাধীনতা আছে তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা'।[১৪] *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় (১৮৭৮) লেখা হয় "আমরা মনে করি মেয়েদের এমন সব বিষয় পড়া উচিত যা তাদের যোগ্য স্ত্রী ও যোগ্য মাতা হতে সাহায্য করবে।"[১৫] সে যুগের মেয়েরা অনেকেই স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর বলে ধরে নিয়েছিল। আমরা একই সময় যদি ইংল্যান্ডের নারী শিক্ষার দিকে তাকাই তাহলেও দেখতে পাব, মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পুরুষদেরও ছিল চরম আপত্তি। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করা ও পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়ে ইংল্যান্ডের মহিলারা কোনো সুযোগ পাননি। অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল অনেক পরে, যথাক্রমে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ ও ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। এই শাসকদের অধীনে ভারতীয় উপনিবেশে নারী শিক্ষার অগ্রগতি যে বাধা পাবে তা ছিল স্বাভাবিক বিষয়। কাদম্বিনী বসুকে চরম লড়াই করে প্রথম মহিলা স্নাতক সম্মান (১৮৮৩) পেতে হয়। পরবর্তীকালে কাদম্বিনী বসু ডাক্তারি পাশ করেন এবং লেডি ডাফরিন কলেজে ডাক্তার হিসাবে কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতে নারী শিক্ষার কর্মসূচিগুলি এমনভাবে রচিত হয়েছিল যেগুলি

Scanned with CamScanner

শিক্ষালাভ করে যেন একটি মেয়ে বিশেষ নারীত্বের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে পারে। গৃহবিজ্ঞান, রন্ধন, অঙ্কন, সংগীত, শিশুপালন ইত্যাদি বিষয়গুলি নারীশিক্ষায় বিশেষভাবে সংযুক্ত করা হয়। মেয়েদের জন্য সে যুগে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হত তার নামকরণগুলি লক্ষ করলে এক বিশেষ শ্রেণি চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন—*বামাবোধিনী* পত্রিকা (১৮৬৩), *অবলা বান্ধব* (১৮৫৯), *মহিলা* (১৮৯৭), *দাসী* (১৮৯৭), *অন্তঃপুর* (১৯৮৯) ইত্যাদি।[১৬] সুতরাং শুরু থেকেই নারী সংক্রান্ত সংস্কার বিষয়টিতে নারীর নিজস্ব চেতনাকে উপেক্ষা করার প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। ভারতীয় নারীত্বে গার্হস্থ্য জীবনে জয়গানের প্রভাব শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নিম্নবর্ণের সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে বিধিনিষেধে কঠোরতা কম থাকলেও ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ক্রমশ সে কঠোরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সংস্কৃতায়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিম্নবর্ণের মানুষেরা নারীর শুচিতা রক্ষাকে মর্যাদার সূচক হিসাবে মানতে শুরু করে। বৈধব্য জীবনের কঠোর সংযম যা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা সুরক্ষিত সামাজিক বিষয়, সেটি ক্রমশ নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে উচ্চমর্যাদার প্রতীক হয়ে ওঠে। বিশেষত বাংলা এবং মহারাষ্ট্রে, সামাজিক মর্যাদার বিচারে এইসব বিষয়গুলি উপরে ওঠার বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়।[১৭] ফলে নিম্নবর্ণের মধ্যেও রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১১.১.১ ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা নারী শিক্ষার অগ্রগতি

ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে স্ত্রী শিক্ষার গতি যে বৃদ্ধি পেয়েছিল সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল কয়েকজন শিক্ষিত ভারতীয় মহিলার উদ্যোগে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার পথিকৃৎ হিসাবে যে চারজন মহিলার নাম উল্লেখ করতে হয়, তারা হলেন—পণ্ডিতা রমাবাঈ (পশ্চিম ভারত), মাতাজি মহারানি তপস্বিনী (দক্ষিণ ভারত), বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন (পূর্ব ভারত) ও ভগিনী সুব্বালক্ষ্মী (দক্ষিণ ভারত)। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে এবং নারীর অধিকার রক্ষায় অন্যতম উগ্র প্রবক্তা ছিলেন পণ্ডিতা রমাবাঈ। কলকাতার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ তাঁর প্রয়াসে মুগ্ধ হয়ে তাকে 'সরস্বতী' আখ্যায় ভূষিত করেন। কলকাতায় অবস্থানকালে তাঁর সঙ্গে বিপিনবিহারী দাস নামে এক যুবকের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু অচিরে স্বামীহারা হয়ে তিনি কলকাতা থেকে পুনায় ফিরে যান এবং 'আর্য মহিলা সমাজ'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের কাজ শুরু করেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডন যাত্রা করেন এবং সেখানে তাঁর ভাবনার সমর্থনে প্রচার শুরু করেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অনুগামীরা গঠন করেন *রমাবাঈ এ্যাসোসিয়েশন*। বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন

Scanned with CamScanner

এবং বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠা করেন বাল্য বিধবাদের জন্য 'সারদা সদন' নামে একটি বিদ্যালয়। গোঁড়া হিন্দু সংস্কারকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি এই বিদ্যালয়ের কাজ চালিয়ে যান এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই বিদ্যালয় প্রায় আশি (৮০) জন বিধবা মহিলা নার্স ও শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলেন। ইতিমধ্যে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয় তার ফলে মহিলা এবং শিশুরা বিশেষভাবে পরিবারচ্যুত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মহিলা ও শিশুদের নিয়ে তিনি গঠন করেন মুক্তি নামে এক আবাসিক প্রতিষ্ঠান। স্ত্রী শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে সংস্কারকদের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বাস্তববাদী ও প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষাক্রমের উপর। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তিনি মহিলা শিক্ষিকা, নার্স ও চিকিৎসক হিসাবে প্রশিক্ষণকে পরিক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে চান। অপেক্ষাকৃত দুর্বল মেধাবী ছাত্রীদের জন্য তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন নানা কর্মমুখী শিক্ষার উপর, যা ছিল সে যুগে অভিনব। নিজে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেও তাঁর লক্ষ্য ছিল হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথার অবসান ঘটানো।

মুসলিম মেয়েদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন। ছোটোবেলায় গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁর স্বামী তাঁকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথম তিনি ভাগলপুরে প্রতিষ্ঠা করেন একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় (১৯০৯)। তাঁর সমাজ সংস্কারে আগ্রহ দেখে আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে। অতঃপর তিনি ফিরে আসেন কলকাতায় এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে একটি বালিকা বিদ্যালয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে তিন ধরনের শিক্ষা দেওয়া হত—সাক্ষরতা, কর্মমুখী শিক্ষা ও দক্ষতামূলক শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ, গৃহবিজ্ঞান এবং শারীরিক সক্ষমতার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর রচিত 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, যে তিনি চেয়েছিলেন একমাত্র শিক্ষায় মেয়েদের জ্ঞানবৃদ্ধি পেশাগত উন্নতির দিক নির্দেশ করতে পারে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ভিতর পর্দাপ্রথা ছিল না, ব্যবহৃত হত মস্তকআবরণী। মস্তকআবরণী এবং নম্রতার শিক্ষা সে যুগের শিক্ষিত মুসলিম মেয়েদের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল। নানা বাধা সত্ত্বেও মুসলিম নারী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল শিক্ষাকে অবহেলা করলে শেষপর্যন্ত ইসলামি সংস্কৃতি বিপন্ন হবে।

দক্ষিণ ভারতের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা গঙ্গাবাঈ ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত। পরবর্তীকালে ইনি মাতাজি মহারানি তপস্বিনী নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিদেশি আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে

Scanned with CamScanner

মাতাজি গড়ে তোলেন 'মহাকালী পাঠশালা', এই পাঠশালা তৈরি করেছিল নিজস্ব পাঠ্যসূচি। জাতীয়তাবাদী পুনরুজ্জীবনবাদীদের সঙ্গে তাঁর ভাবনার ছিল অনেক মিল। এই পাঠশালায় পড়ানো হত ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ, কিংবদন্তি, যেগুলির মধ্য দিয়ে নারীর কর্তব্য ও ধর্মকে তুলে ধরা হত। এই বিদ্যালয়ে রন্ধনের পাঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সে যুগের সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে মেয়েরা শিক্ষিত হলে রান্না ঘরে ঢুকতে চাইবে না। ফলে চিরাচরিত ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে। তাই মাতাজি তাঁর পাঠশালায় যেমন রন্ধন পাঠকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তেমনি একই সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতিরও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাজের ভগিনী সুব্বালক্ষ্মীর প্রচেষ্টা ছিল হিন্দু পরিবারের বিধবাদের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তিদান। এগারো বছর বয়সে বাল্যবিধবা হয়ে পিতৃগৃহে চলে আসার পর, পিতা কিন্তু তাঁকে বৈধব্যের কঠোর বিধিনিষেধে আবদ্ধ না রেখে শিক্ষার সুযোগ করে দেন। পরিণতিতে সমাজের চাপে পিতা ও মেয়েকে গ্রাম ছাড়তে হয়। মাদ্রাজে আশ্রয় নিয়ে সন্ন্যাসিনী শিক্ষিকাদের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে। তাঁর সেবামূলক মনোভাবের জন্য 'সিস্টার' নামে জনসমাজে পরিচিত হন। মূলত সরকারি সহযোগিতা নিয়ে তিনি বাল্য বিধবাদের জন্য গড়ে তোলেন আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (১৯১২)। এই কেন্দ্রে প্রথমে ছাত্রীদের দেওয়া হত প্রথাগত শিক্ষা এবং পরে কুইন মেরি'জ কলেজে (মাদ্রাজ) ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া হত। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'লেডি ওয়েলিংটন ট্রেনিং কলেজ'। অধ্যক্ষা হিসাবে সুব্বালক্ষ্মী এই কলেজে তিন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন—উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য প্রশিক্ষণ, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণ। পরবর্তীকালে বয়স্কা বিধবাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সারদা বিদ্যালয়' নামে আবাসিক প্রতিষ্ঠান।

আলোচ্য ভারতীয় শিক্ষিত সংস্কার মনস্ক মহিলারা যে শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন তার পাঠক্রম লক্ষ করলে দেখা যায়, মেয়েরা গৃহবধূ হিসাবে যাতে পেশাদার হয়ে উঠতে পারে সেদিকেই বেশি গুরুত্বদান। যদিও এই প্রয়াস কমসংখ্যক শিক্ষিত মহিলাদের আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মেয়েদের প্রয়োজনে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান দরকার সে কথা জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছিল। ভারতীয় মেয়েদের উদ্যোগে মেয়েদের জন্য এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে শেখে। উচ্চশিক্ষায় পুরুষদের সঙ্গে সংখ্যালঘু মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ ছিল তাদের কাছে দুর্বিষহ। কিন্তু মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় গড়ে ওঠায় অভিজ্ঞতার দ্বারা 'নতুন নারী' বুঝেছিল সমাজের কাছে তাদের পাওনা কতটুকু। নারী শিক্ষার জন্য আলোচ্য প্রচেষ্টাগুলি অপ্রতুল হলেও বিংশ শতকের

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় দশকের পর থেকে নারী প্রগতির পথে নানা বাধা ক্রমশ সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছিল।

Scanned with CamScanner